International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 62-69
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.269

বাংলা মঙ্গলকাব্যে বন্দর সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গ

মানিক দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোস্টাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার,
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since ancient times, India's overseas trade enjoyed remarkable prominence. This is evident not only in ancient religious texts but also in the accounts of various travellers and historians. From early periods, the ports of Bengal – such as Tamralipta, Harikela, Dandabhukti, and Saptagram – were widely celebrated in different strands of literature. In Medieval Bengali literature, poets offered rich and vivid descriptions of these ports and maritime routes, often portraying the trading voyages of local merchants. After the eighth century, when the course of the Saraswati River shifted, Tamralipta gradually lost its significance. At the same time, Saptagram rose to prominence as a thriving center of commerce. The Poets of the Mangal-Kavya tradition frequently referred to the commercial glory of Saptagram in the "Banijya Pattan" (mercantile episode) sections of their works. Through their narratives, they depicted the prosperity, wealth, and vibrant mercantile life of its trading community. To the merchants, Saptagram was not merely a trading hub – it held a special allure. Together with Triveni, it was often regarded almost as a sacred space, a destination imbued with a sense of pilgrimage and spiritual fulfilment.

Keywords: Saptagram, The Merchant, Trading, Port, Tribeni, Saraswati River, MangalKavya, Medieval Bengali Literature, Hooghly

তিন দিক সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রাচীন ভারতবর্ষের জলবাণিজ্য বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছিল। ভারতীয় বণিকরা জলপথে পাড়ি দিয়েছিল দেশান্তরে। সেই বাণিজ্যের সূত্রপাত কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে কাল নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সমুদ্র যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য ঋগ্বেদে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংকলিত মনুসংহিতায়, খনার বচনে, প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারতে, এমনকি ভারতীয় পুরাণ ও বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলিতে সমুদ্র যাত্রার কথা আছে। সম্ভবত এই বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল ফসল ও গৃহপালিত পশুর (বিশেষতঃ গরু) মধ্যে বিণিময় প্রথার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদী ও তাদের শাখানদী, উপনদীর দ্বারা সৃষ্ট বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চল বাংলার উপকূলে সাগরকে ছুঁয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বেশিরভাগ অংশ নদনদী অববাহিকার দ্বারা সৃষ্ট বলে উর্বর বঙ্গদেশ সুজলা সুফলা হয়ে উঠেছিল, কৃষিজ ফসলে প্রাচুর্য হয়ে উঠেছিল। উৎপন্ন কৃষিজ পণ্যের পাশাপাশি খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল বঙ্গদেশ। তাই নদী অববাহিকা ধরে বঙ্গদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীক, রোমান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিবৃত্ত জানা যায়। মূলত নদী

অববাহিকাই ছিল সেই বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পথ। বিদেশী বণিকরা যেমন সাগর পেরিয়ে নদীপথে এসে বঙ্গদেশে বাণিজ্যিক আদান প্রদান করত সেইরকম বাঙালি বণিকরাও নদীপথের মাধ্যমে সাগরে পৌঁছাত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া বাঙালি বণিকরা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য করত নদীপথেই। তাই বিভিন্ন জায়গায় নদীবন্দর গড়ে উঠেছিল। বঙ্গদেশের এরকমই কয়েকটি প্রাচীন বন্দরের নাম হল তাম্রলিপ্ত, গঙ্গা বন্দর বা গাঙ্গে, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, চট্টগ্রাম, কাশিমবাজার, কোগ্রাম, হুগলি, ক্যানিং ও কলকাতা, উজানীনগর, মঙ্গলকোট প্রভৃতি। চতুর্দশ শতক থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একাধিক বর্ণনায় এই সমস্ত বন্দর গুলির মাধ্যমে বণিক সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত উল্লেখ আমরা পাই। এর মধ্যে সপ্তগ্রাম হল এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য নদী বন্দর।

সপ্তগ্রাম নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক পৌরাণিক কাহিনী। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে জানা যায় কান্যকুব্জের রাজা প্রিয়বন্তের সাত সন্তান ছিল। যথা-অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন ও ভব্য। তারা ভাগীরথী ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী এক জায়গায় তপস্যা করে ঋষিত্ব অর্জন করেন। তারা যে সাতটি গ্রামে তপস্যা করেছিলেন পরে সেই গ্রামগুলিকে একত্রে সপ্তগ্রাম বলা হয়। তার মধ্যে চারটি গ্রাম হল বাসুদেবপুর, বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর ও শিবপুর। কিন্তু অপর তিনটি গ্রাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন বাকি তিনটি গ্রাম হল খামারপাড়া, দেবানন্দপুর এবং ত্রিশ বিঘা (বর্তমানে আদি সপ্তগ্রাম)।আবার কারোর কারোর মতে বাকি তিনটি গ্রাম হলো নিত্যানন্দপুর, সাম্বাচোরা, বদলঘাটি।

অষ্টম শতকের শেষভাগে যখন তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্ব কমতে শুরু করে তখন সরস্বতী নদীর গতিপথে সপ্তগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সপ্তগ্রাম প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বিশিষ্ট জনপদ ছিল। একসময় এটি সূক্ষ্মভূমির অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে বন্দর শহর হিসাবে সপ্তগ্রামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে সমৃদ্ধশালী একটি জনপদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তগ্রামের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-

> "কলিকাতা হইতে ৩১ মাইল দূরবর্তী ইষ্টইণ্ডিয়ান
> রেলপথ ত্রিশ বিঘা স্টেশন হইতে মগরা স্টেশনের
> নিকটবর্তী সরস্বতী নদীর সেতু পর্যন্ত সপ্তগ্রামের
> ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃতি। ত্রিশ বিঘা হইতে পূর্বে
> বাঁশবেড়িয়া ও উত্তরে মাগরাগঞ্জ ও ত্রিবেণী হইতে
> পশ্চিমে মগরা ও বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত যদি একটি
> চতুরঙ্গ ক্ষেত্র কল্পনা করা যায় তাহা হইলে সেই
> ক্ষেত্রটিই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ।"[১]

বর্তমানের হুগলিতে অবস্থিত মধ্যযুগের ত্রিবেণী, যা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল। গঙ্গা, দামোদর ও রূপনারায়ণের বিপুল জলরাশি প্রবাহিত হত সরস্বতীর খাতে। লক্ষণীয় যে এই ত্রিবেণী সঙ্গমস্থলে সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রাম বন্দর সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।সরস্বতী নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পায় আর অপরদিকে সেই সময়েই সরস্বতীর পূর্বতটে অবস্থিত সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধি হতে শুরু করে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে বাণিজ্যিক আদান প্রদান প্রচলিত ছিল সেই বানিজ্যের ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু হয়। তার ফলে সপ্তগ্রাম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, হয়ে উঠেছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার অন্যতম রাজনৈতিক কেন্দ্র। এ প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন-

"ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বা শেষার্ধে ত্রিবেণীর
দুই মাইল দূরে, ভাগীরথী সঙ্গমের সন্নিকটে সরস্বতীর
তীরে সপ্তগ্রামে এক সুবৃহৎ বন্দর-নগর গড়িয়া উঠে
এবং সেন-রাজাদের রাজধানী বিজয়পুরের মর্যাদা অবলুপ্ত
করিয়া দেয়। ষোড়শ পর্যন্ত সপ্তগ্রাম শুধু বৃহত্তম বাণিজ্য
কেন্দ্র নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজধানী,
মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র।"[২]

মধ্যযুগের সপ্তগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। সপ্তগ্রামের বণিক সমাজই সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধির মূল কান্ডারী। বণিক সমাজের বাণিজ্যিক ধনে সপ্তগ্রাম রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। গঙ্গা ও ভাগীরথী নদীর প্রবাহপথ অবলম্বন করে প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বণিকরা দক্ষিণ ভারত ও সিংহলের সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চালিয়ে গেছে। 'কোলণ্ডিয়া' নামক একপ্রকার বিশেষ জাহাজে করে গঙ্গারিডয় সভ্যতার কাল থেকে গঙ্গা বন্দর, তাম্রলিপ্ত বন্দর এবং পরবর্তীকালে সপ্তগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে তাদের দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে। গঙ্গা বন্দরের প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল তা জানা যায়নি তবে কেউ কেউ এটিকে সপ্তগ্রামের পাশাপাশি অবস্থিত একটি অঞ্চল বলে মনে করেছেন। আবার কেউ বা বলেছেন এর অবস্থান ছিল গঙ্গাসাগর তীর্থে। বিভিন্ন পর্যটকদের বর্ণনায় সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি, সপ্তগ্রামের বিকাশ স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। ইবন বতুতা সপ্তগ্রামকে আন্তর্জাতিক বন্দর হিসাবে চিহ্নিতকরণ করেছেন (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে)। সেই সময় চীনের সঙ্গে ভারতের যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলতো তা প্রমাণ করে। সেন আমলে বাঙালি বণিকদের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের আমলে (১১৮৫ – ১২০৬) সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধশালী এক বন্দর ছিল। পরবর্তীকালে বাদশাহ মহম্মদ তুঘলকের সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়। সেগুলি হল সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম, লক্ষণাবতী ও সোনারগাঁ। অতএব বন্দরের পাশাপাশি বঙ্গদেশে জনপদ হিসেবে সপ্তগ্রামের জনপ্রিয় কতটা ছিল তা সহজেই অনুমেয়। শুধু ইবন বতুতা নয় বারবোসা, তোম পিরেজ, সিজার ফ্রেডারিক প্রমুখের বর্ণনায় সপ্তগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্য পাটন অংশে এই সপ্তগ্রামের গৌরবগাথা বর্ণিত হয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগরের, শ্রীমন্তের সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার প্রসঙ্গ রয়েছে। তাদের যাত্রাপথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হল এই সপ্তগ্রাম বন্দর। মনসামঙ্গলের কাব্যের অন্যতম কবি বিপ্রদাস পিপিলাই। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত তার মনসা বিজয় কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রার প্রসঙ্গে যে ভৌগলিক বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন প্রাচীন ঐতিহ্যের এক রূপরেখা। দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রার সময় তিনি পথে বিভিন্ন জায়গায়(ইন্দ্রঘাটে ইন্দ্রের, সপ্তগ্রামে উমা-মহেশ্বরের, কালীঘাটে কালিকার,বেতড়ে বেতাই চণ্ডীর) পূজা দেন। ত্রিবেনীর তীর্থ কার্য সম্পন্ন করে তিনি সপ্তগ্রাম দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।–

"বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদো অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্তঋষি স্থান সর্বদেব অধিষ্ঠান
সোক্ষ মোক্ষ রম্যন্তর ধাম ।।

যদি হৈয়া শুদ্ধমতি ঋষি মুনি সেবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা নিবসে তথি
অধিষ্ঠান উমা-মহেশ্বর।।"[৩]

সপ্তগ্রামের সম্পর্কে চাঁদ সওদাগরের এই কৌতূহল প্রমাণ করে তৎকালীন সময়ে সপ্তগ্রামের জনপ্রিয়তা। বন্দর হিসাবে সপ্তগ্রামের জনপ্রিয়তা তো ছিলই, সে সঙ্গে সপ্তগ্রাম হয়ে উঠেছিল এক অন্যতম ধর্মীয় পীঠস্থান। ত্রিবেণীর গঙ্গা, উমা মহেশ্বর-এর অধিষ্ঠান এবং তার সঙ্গে তথা সপ্ত ঋষির পৌরাণিক কাহিনী স্থানটির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে। বাণিজ্যে বণিকদের আর্থিক বৃদ্ধিলাভ এবং দূরসমুদ্র বাণিজ্য যাত্রার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সম্ভবত সপ্তগ্রামে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। তবে সপ্তগ্রামের মূল খ্যাতি সেখানকার বণিক সমাজের জন্য। কবি বিপ্রদাস সমৃদ্ধশালী সপ্তগ্রামের বিত্তবান বণিক সমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন ---

"অভিনব সুরপুরী দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের বারা।
নানা রত্ন অবিশাল জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল
গজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা ।।
সভে দেবে ভক্তি অত প্রতি ঘরে নানা মূর্তি
রত্নময় সকল প্রসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্দি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি দেখি
রাজা বড়ই প্রমোদে।।"[৪]

মনসামঙ্গল কাব্যধারার আরেকজন অন্যতম কবি ছিলেন নারায়ণ দেব। তার কাব্যের রচনাকাল সঠিকভাবে না জানা গেলেও প্রায় সকলের মতে তিনি বিপ্রদাসের পূর্বসূরি ছিলেন। নারায়ণ দেবের কাব্যে আমরা দেখি চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্রের মৃত্যুর উপর চাঁদ সদাগর বাণিজ্য যাত্রায় গেছে। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রায় এক এক করে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কামারহাটি, মুলাজোড় প্রভৃতি জনপদ গুলো উল্লেখিত হয়েছে। নারায়ণদেবের চাঁদ সওদাগর সেই সপ্তগ্রামের পথ ধরে বাণিজ্য যাত্রায় গেছে।

"ত্রিপিণীতে দিয়া ভাটী সপ্তগ্রাম কুমারহাটী
রাত্রি দিনে বাহিয়া এড়ায়।
মঞ্জিল গউল করি রন্ধন ভোজন করি
ভাটিয়ালে নাওড়া বাওয়ায়॥"[৫]

কিন্তু কাব্যের এই অংশটিতে আমরা 'শ্রীজগন্নাথ' নামে কোন এক ব্যক্তির ভণিতা পাই। ভণিতায় ব্যবহৃত এই নামটির সঙ্গে নারায়ণ দেবের কোন সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। তাই এটি নারায়ণ দেব-এর রচনা কিনা সন্দেহ আছে। হয়তো বা এটি প্রক্ষিপ্ত অংশ, পরে লিপিকর জুড়ে দিয়েছেন। চৈতন্য পরবর্তী কালের মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ শতকের কবি ছিলেন। তার কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা অংশে সপ্তগ্রামর উল্লেখ সেভাবে না পেলেও লখিন্দরের বিবাহ সভার বর্ণনায় সপ্তগ্রামের কথা উল্লেখিত রয়েছে।

"বর্দ্ধমান উজানিনগর আর সপ্তগ্রাম।
যতেক বণিক আইল কত লব নাম।।"[৬]

শুধু বন্দর নয় মধ্যযুগে সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করে এক বণিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। আত্মীয়-বন্ধু ও জ্ঞাতি বর্গের অনুষ্ঠানে তারা একত্রিত হত। লখিন্দরের বিবাহকে কেন্দ্র করে বর্ধমান উজানীনগর সপ্তগ্রামের বণিক সমাজ একত্রিত হয়েছিল। মধ্যযুগের সপ্তগ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা সহজেই এখান থেকে অনুমান করা যায়।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি মানিক দত্ত হলেও এই কাব্য ধরার প্রথম উল্লেখযোগ্য কবি হলেন কবি দ্বিজমাধব বা মাধবাচার্য। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'মঙ্গলচন্ডীর গীত' নামে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কবি সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর কাব্য তিনি এই অঞ্চলেই বসে রচনা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে গিয়ে বসতি স্থাপন করার জন্য দিজমাধবের চন্ডীমঙ্গল পূর্ববঙ্গে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। কবি তাঁর কাব্যে উজানিনগর থেকে সিংহল যাত্রাপথের মোট চারবার বর্ণনা দিয়েছেন। এই বর্ণনাগুলোতে হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একাধিক জায়গার প্রসঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে বেশ কয়েকবার কবি সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেনীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। এই সপ্তগ্রাম এর পথ ধরে ধনপতি সওদাগর সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য যাত্রায় গেছে –

"গাবর সবে সারি গায়ে শুনিতে অনুপাম।
গহরপুর বাহি ডিঙা গেল সপ্তগ্রাম।।"[৭]

ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের চন্ডীমঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম কবি মুকুন্দরামের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের রাজ্য বিক্রমকেশরী আদেশে ধনপতি সওদাগর সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যে গেছে। তার যাত্রাপথে সপ্তগ্রামে এসে সওদাগর বিশ্রাম করেছেন।–

"রাঢ়া মাঝে সপ্তগ্রাম অতি অনুপাম
দ্বিনা দুই সাধু তাহে করিল বিশ্রাম।
কিন্যা বেচ্যা নানা ধন নায়ে দিল ভরা
বাহ বাহ বল্য ঘন নায়ে হৈল ত্বরা।"[৮]

রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে সপ্তগ্রামের জনপ্রিয় পরিচিতি ছিল যে তা কবির এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট। যাত্রাপথে ধনপতি সওদাগর শুধু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সেখানে থামেননি। দুই দিন সেই সপ্তগ্রামে থেকে তিনি কেনা-বেচাও করেন। কবির এই বর্ণনা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে ষোড়শ শতকে বাণিজ্য নগরী হিসেবে সপ্তগ্রামের খ্যাতি কতটা ছিল। বঙ্গদেশের বণিক ছাড়া ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বণিকদের বাণিজ্যের অন্যতম স্থান ছিল সপ্তগ্রাম। কবি অন্যত্র বলেছেন-

"কলিঙ্গ তেলেঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট।
.....
আর সফর কত বলিবারে নারি।
এ সব সফরে জত সদাগর বৈসে
জঙ্গ ডিঙ্গা লইয়া তারা বাণিজ্যেতে আইসে।
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাহ না জায়
ঘরে বস্যা সুখমোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থ মথ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম
সপ্তঋষির শাসন বলায় সপ্তগ্রাম।"[৯]

সপ্তগ্রামে বসবাসকারী বণিকরা কতটা সমৃদ্ধশালী ছিল, বিত্তশালী ছিল তা উদ্ধৃত অংশটির তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধরার আরেক কবি দ্বিজ রামদেব তাঁর 'সারদাচরিত' কাব্যে বিভিন্ন জায়গায় সপ্তগ্রামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ধনপতি সওদাগর তার পুত্র শ্রীমন্তের (শ্রীপতি) সিংহল যাত্রা ও সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের অন্যতম পথ সপ্তগ্রাম ত্রিবেনীর পথ।

কবি বিপ্রদাসের কাব্যে আমরা সপ্তগ্রামের রাজার কথা পাই। সপ্তগ্রামের বণিক সমাজে যে রাজার প্রতি বেশ অনুরক্ত ছিল তা আমরা সপ্তদশ শতকের কবি কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য থেকেও জানতে পারি। কৃষ্ণরামের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল ১৬৭৯-৮০ খ্রিস্টাব্দ। সেই সময়ে সপ্তগ্রামে শত্রুজিৎ নামক এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। কবির কাব্যে সপ্তগ্রামের হিন্দু রাজা শত্রুজিতের প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে।–

"সপ্তগ্রাম (নাম ধরণীতে) নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই, নাই দুঃখ শোক ॥
শত্রুজিত রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরিএ যতগুণ কহিতে কি পারি।।"[১০]

কবি কৃষ্ণরাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল' ছাড়াও আরো কয়েকখানি কাব্য রচনা করেছিলেন- 'কালিকামঙ্গল'(১৬৭৬), 'রায়মঙ্গল'(১৬৮৬), 'শীতলামঙ্গল'। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যটি 'রায়মঙ্গল' কাব্যের পরবর্তীকালে লেখা, অর্থাৎ ১৬৮৬-এর পরে সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে। 'শীতলামঙ্গল' কাব্যটিতে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী দ্বারা শীতলার মাহাত্ম্য গীত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দুটি কাহিনীর (মদনদাস জগাতির কাহিনী, কাজী কাহিনী) বিষয়বস্তু মৌলিক হলেও তৃতীয় কাহিনী হৃষিকেশ সাধুর বাণিজ্য যাত্রা মুকুন্দ চক্রবর্তীর ধনপতি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। হৃষিকেশ সাধু উজানীনগর থেকে যাত্রা শুরু করে ত্রিবেনীর পথ ধরে বাণিজ্যযাত্রায় গেছেন। কবির 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় সপ্তগ্রাম এর উল্লেখ পাওয়া গেছে-

"অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগনা তার।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকুল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার।।"[১১]

সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে সপ্তগ্রাম বন্দর মোগলদের দখলে চলে আসে। সপ্তগ্রাম সরকার গঠিত হয় এবং কলকাতার পরগনার অন্তর্গত হয়। সপ্তদশ শতকে সপ্তগ্রাম বন্দরের ঐতিহ্য ও আভিজাত্য হারিয়ে গেলেও নাম মাহাত্ম্য যে মোটেও কমেনি উদ্ধৃতাংশে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি দ্বিজ রঘুনন্দন রচিত 'পঞ্চাননমঙ্গল' কাব্যে পঞ্চানন ঠাকুরের মাহাত্ম্য গীত রচিত হয়েছে। 'পঞ্চাননমঙ্গল' কাব্যটির সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি। তবে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে পাওয়া পুথীর নকল থেকে অনুমান করা যায় অষ্টাদশ শতকে প্রথমার্ধে কোন এক সময়ে কাব্যটি রচিত হয়েছে। কাব্যের নায়ক মণিময় উজানী নগর থেকে যাত্রা শুরু করে আদি গঙ্গায় এসে পৌঁছেছে। পথে ত্রিবেণী, বেতাইচণ্ডী সহ বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করে করে গেছে। আবার উজানীনগর এ প্রত্যাবর্তনের পথ প্রায় একই। ফেরার পথে চিৎপুর, দক্ষিণেশ্বর, মাহেশ, চুঁচুড়া, ত্রিবেণী, মর্দ্যপুর হাসানহাটা হয়ে তার ডিঙ্গা এগিয়ে চলেছে-

"চুচুড়ার সাঁড়েশ্বরে প্রণাম করিয়া।
সপ্তগ্রামে মণিময় উত্তরিল জায়্য।।

ত্রিবেণীর মহাস্থান পর্চাত করিআ।
মদ্যপুর হাসনঘাটা জায় ডিঙ্গা বায়্যা।।"[১২]

সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবিবল্লভ রচিত 'সত্যনারায়ণের পুথি' একটি পাঁচালি পাওয়া যায়। কবিবল্লভের এই পাঁচালীতে বণিক সদানন্দ রাজার আদেশে বাণিজ্য যাত্রায় যাচ্ছেন। যাত্রাপথে তিনি সপ্তগ্রাম অতিক্রম করে যাচ্ছেন-

"বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর।।
সপ্তগ্রাম বাহি সাধু পাইলা ত্রিপীনি।
হুগলি প্রবেস হল্য সাধুর তরণি।।
নাএ বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ।
তিন দিন বাহি সাধু পাইল দিগঙ্গ।।"[১৩]

সপ্তগ্রামে, ত্রিপীনি (ত্রিবেনী) অতিক্রম করে সওদাগর হুগলি (বন্দর) তে প্রবেশ করেন। হুগলিতে নৌকায় বসে তিনি 'রঙ্গ' দেখলেন। ততদিনে সপ্তগ্রামের গৌরব হারিয়ে ফেলেছে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে গড়ে উঠেছে রঙ্গে ভরা হুগলি বন্দর। সরস্বতী নদী মজে আসার ফলে সপ্তগ্রাম বন্দরের পতন শুরু হয় এবং হুগলি বন্দরের উত্থান শুরু হয়। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজরা মোঘল সম্রাট আকবরের কাছ থেকে হুগলি বন্দরের কাজ শুরু করার অনুমতি আদায় করে। পরবর্তীকালে ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট শাহজাহান সিংহাসনে বসার পরে হুগলি বন্দরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সপ্তগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করে। পর্তুগিজ বণিকদের আগমন এই সপ্তগ্রাম বন্দরের অবনতির অন্যতম কারণ। পর্তুগীজ বণিকরা দেশীয় বণিকদের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করতে লাগলো। পণ্যের মূল্য কম দেওয়া, পণ্য লুট করা, বাণিজ্যপোত গুলি দখল করার মতন অমানবিক আচরণ করতে লাগলো। শুধু বাঙালি বণিক নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী সকল বণিকদের উপর তারা অত্যাচারী হয়ে উঠল। তাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে শুরু করল। ধীরে ধীরে সমগ্র সপ্তগ্রাম পর্তুগীজদের দখলে চলে যায় সপ্তগ্রাম বন্দরের নাম দেয় 'Parto Pequeno' বা 'ক্ষুদ্র বন্দর। সপ্তগ্রামের বণিক সমাজ শেঠ, বসাকেরা পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করে এবং কলকাতায় থেকে ব্যাবসা-বানিজ্য করতে শুরু করে। কালের প্রবাহে সপ্তগ্রাম বন্দর ভৌগলিক মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেলেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পাতায় সপ্তগ্রাম বন্দরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উল্লিখিত হয়ে রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) হুগলি জেলার সেকাল-একাল: প্রথম পর্ব। দে'জ পাবলিশিং। এপ্রিল ২০১৪। কলকাতা ৭৩। পৃ. ২৮৩।
২) ড. রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙালি ইতিহাস: আদিপর্ব। দে'জ পাবলিশিং। অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০। কলকাতা ৭৩। পৃ. ২৯৯।
৩) ড. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়: পুনর্বিচার। মন্ডল বুক হাউস। সপ্তম সংস্করণ, জুলাই ২১। কলকাতা ০৯। পৃষ্ঠা ১০০- ১০১।
৪) তদেব, পৃ. ১০১।
৫) দাশগুপ্ত, শ্রীতমোনাশ। সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়। ২০১১।পৃ. ১৮৯

৬) মিত্র, তন্ময়; করিম, মীর রেজাউল; যশ, সুবোধ কুমার (সম্পাঃ)। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১০। কলকাতা ০৯।পৃ. ৫১।

৭) ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ (সম্পাদিত) । দ্বিজ মাধব: মঙ্গলচণ্ডীর গীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ. ২৩৫।

৮) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত)। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল। সাহিত্য অকাদেমি। বৈশাখ ১৩৬২। নয়াদিল্লি ০১। পৃ. ১৯৬।

৯) তদেব, পৃ. ২৩১।

১০) ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ (সম্পাঃ)। কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1958।কলকাতা। পৃ. ১৫১।

১১) তদেব পৃ. ০৭।

১২) মণ্ডল, শ্রীপঞ্চানন (সম্পাদিত)। দ্বাদশ-মঙ্গল।বিশ্বভারতী। ১৯৬৬। শান্তিনিকেতন। পৃ. ২৪৮।

১৩) করিম, মুন্সি আব্দুল (সম্পাঃ)। সত্যনারায়ণের পুথি: শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির। ১৩২২। কলকাতা, পৃ. ০২।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) ড. ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ: মে ২০১৫। কলকাতা ৭৩।

২) চৌধুরী, কমল (সম্পাঃ)। মধ্যযুগে বাঙ্গলা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । দে'জ পাবলিশিং। ২০২১। কলকাতা ৭৩।

৩) রুদ্র, কল্যাণ। দুই বাংলার নদীকথা। সাহিত্য সংসদ। ২০২১। কলকাতা ০৯।

৪) সমাজদার, সুভাষ। বাণিজ্যে বাঙালী সেকাল ও একাল। শঙ্খ প্রকাশন। বৈশাখ ১৩৭২। কলকাতা ০৯

৫) ভট্টাচার্য, তন্ময়। বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ। মাস্তুল। ডিসেম্বর ২০২৩। হুগলি।

৬) Dr. Mukherjee, Radhakamal. The Changing Face of Bengal: A Study in Reverine Economy. University of Calcutta, 2008-2009.

৭) রায়, অনিরুদ্ধ। মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (১২০০–১৭৫৭)। মিত্রম্। ২০২০। কলকাতা ৭৩

৮) ড. সেন, দীনেশ চন্দ্র। বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড) । দে'জ পাবলিশিং। দে'জ পুনর্মূদ্রণ জানুয়ারি ১৯৯৩। কলকাতা ৭৩ ।

৯) চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) হুগলি জেলার সেকাল-একাল: প্রথম পর্ব। দে'জ পাবলিশিং। এপ্রিল ২০১৪। কলকাতা ৭৩।

১০) চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)। হুগলি জেলার সেকাল-একাল: দ্বিতীয় পর্ব। দে'জ পাবলিশিং। এপ্রিল ২০১৪। কলকাতা ৭৩।